Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাসুমা খাতুন

রোলঃ ২৩১০০১২১৭২০

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাসুমা খাতুন

রোলঃ ২৩১০০১২১৭২০

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " তাকওয়া " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাসুমা খাতুন, আইডিঃ ২৩১০০১২১৭২০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " তাকওয়া " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মাসুমা খাতুন

আইডিঃ ২৩১০০১২১৭২০

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

তাকওয়া 1

তাকওয়ার গুরুত্ব 2

তাকওয়ার স্তরসমূহ 5

তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য 6

তাকওয়া অর্জনের উপায় 9

সামাজিক জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 13

তাকওয়ার ফজিলত 16

আল্লাহভীতির আলামত 21

তাকওয়ার উপকারিতা 23

তাকওয়া ও আশা 26

ইলম ও আমলের প্রতি মনোযোগী হওয়া 29

উপসংহার 31

ভূমিকা

"সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তার নিকট ক্ষমা ও সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না।

হে আমার রব! আপনি আমাদের অন্তরে তাকওয়া দান করুন যার মাধ্যমে আমরা কিয়ামত দিবসের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি।

যার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় রয়েছে, তার জন্য রয়েছে মহাপুরষ্কার। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ

'যে ব্যক্তি তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে রয়েছে দুটি উদ্যান।' (সুরা আর-রহমান: ৪৬)

তাকওয়া শুধু ভয়-ভীতির মাধ্যমে অর্জিত হয় না বরং ভয়-ভীতির পাশাপাশি আল্লাহর নিয়ামত অর্জনের আশা করার মধ্যে রয়েছে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে সফল জীবন গঠন করতে সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে গুণটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো "তাকওয়া"।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

(সূরা আন-নিসা: ১)

এই আয়াতে তাকওয়ার মাধ্যমে মানবজীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তাকওয়া ইসলামের অন্যতম মৌলিক ও কেন্দ্রীয় ধারণা। এটি এমন একটি আত্মিক ও নৈতিক গুণ যা মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, আনুগত্য এবং জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। কুরআন ও সুন্নাহতে বারবার তাকওয়ার গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটিকে মানুষের মর্যাদা, সফলতা ও নাজাতের প্রধান মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাকওয়া

তাকওয়া হলো অন্তরে থাকা আল্লাহর প্রতি ভয়। তার ও তার সৃষ্টির প্রতি সম্মান-মর্যাদা রাখা। আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার আশায় এবং তার শাস্তির ভয়ে সব ধরনের পাপ, অন্যায় ও নিষিদ্ধ কাছ থেকে নিজেকে বিরত রেখে সৎ ও পুণ্যময় জীবনযাপন করাই হলো তাকওয়া।

তাকওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো সব সময় অন্তরে আল্লাহর উপস্থিতি ও নজরদারি অনুভব করা। তার আদেশগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করা। তাকওয়া মুমিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ١٠٢

“ হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যথাযথ হয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না।”(সূরা আল ইমরান ৩: ১০২)

আবু আবদুল্লাহ তিওনিসি বলেন, ‘তাকওয়া মূলত এতটুকুই যে, আল্লাহর আদেশকৃত বিষয়ের ওপর আমল করা হবে এবং নিষিদ্ধ বিষয়কে পরিত্যাগ করা হবে। "(বাসাইরু যাওয়িত তাময়ীয : ৫/২৫৭)

খলিফা উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহুও তাকওয়ার পরিচয় দেয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংক্ষেপ করে বলেন, ‘ আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন তা পরিত্যাগ করা এবং যা ফরজ বা আবশ্যক করেছেন তা আদায় করার নাম হলো তাকওয়া’।"(আল-মাতলাউ আলা আবওয়াবিল মুক্বনি’ : ৯৯)

প্রসিদ্ধ তাবিঈ তলক ইবনু হাবিব বলেন, “তাকওয়া হলো তুমি আল্লাহ তায়ালার দেয়া নূর অনুযায়ী সাওয়াবের আশায় তোমার আল্লাহকে অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ তাআলার দেয়া নুর

অনুযায়ী আযাবের ভয়ে তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকবে।”(কিতাবুয যুহদ-লিআবদিল্লাহ ইবনিল মুবারক : ৪৭৩, জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১৪৯)

তাকওয়া হচ্ছে সব ভালো কাজের উৎস, পূণ্য কাজের জন্য পথ দিশারী। তাকওয়া হচ্ছে কাজের মাধ্যমে আল্লাহর আযাব থেকে বেঁচে থাকা।যে তাকওয়া অর্জন করে তাকে মুত্তাকী বলে।আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তিনি মুত্তাকিদের জন্য নিয়ামত সমৃদ্ধ জান্নাত কে সাজিয়ে রেখেছেন। মুত্তাকিদের ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ لَهُمۡ غُرَفٞ مِّن فَوۡقِهَا غُرَفٞ مَّبۡنِيَّةٞ

কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। (সুরা আয-যুমার: ২০)

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলা- এরই নাম তাকওয়া। সুস্পষ্ট হারাম কী কী তা তো আমরা একটু অধ্যয়ন করলেই জানতে পারবো। কিন্তু যেগুলো স্পষ্ট নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা মুফতীগণের শরণাপন্ন হব এবং নিজের বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার করব। আল্লাহ আমাদেরকে তাকওয়াবান হওয়ার দান করুন- আমীন।

তাকওয়ার গুরুত্ব

তাকওয়া মুমিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। তাকওয়া মানে শুধু ভয় না। তাকওয়া মানে আল্লাহ সুরক্ষায় চলে যাওয়া। মূলত তাকওয়া হচ্ছে অন্তরের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। সহজে বললে আল্লাহ

ভীতি। তাকওয়াই দুনিয়ার যাবতীয় অন্যায় ও পাপ থেকে মানুষকে মুক্ত রাখে। আল্লাহর ভয়ে গুনাহ-মুক্ত জীবন গঠন করা ব্যক্তিরাই দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়েছে। তাকওয়াকারীদের জন্য আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সমস্যা থেকে মুক্তির পথ সহজ করে দেন তাদের সব কাজে সফলতা দান করেন।
আল্লাহকে ভয় করার ফজিলত অনেক। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় যত বেশি,সে তত বেশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে এবং পরকালে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে।

<u>কুরআনে তাকওয়ার গুরুত্ব</u>

 কুরআন মাজীদে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য অনেক সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে "তাকওয়া" এবং এর বিভিন্ন রূপ প্রায় ২৫০ বারেরও বেশি উল্লেখ হয়েছে।
 পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না।

 # আল্লাহর নিকট মর্যাদার মাপকাঠি

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যে অধিক তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত। "(সূরা আল-হুজুরাত: ১৩)

 # আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের সুসংবাদ :

اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁদের সাথে থাকেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। (সূরা নাহল - ১৬ : ১২৮)

 # শ্রেষ্ঠত্বের সুসংবাদ :

وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

“যাঁরা তাকওয়া অবলম্বন করে তারা কিয়ামতের দিন তাদের (কাফেরদের) উপরে থাকবে।”(সূরা বাকারা -২: ২১২)

 # আল্লাহর মহব্বতের সুসংবাদ :

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালোবাসেন।” (সূরা তাওবা -৯ : ৪)

 # সফলতার চাবিকাঠি

আল্লাহ বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধর ও ধৈর্যে অটল থাক এবং পাহারায় নিয়োজিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও।"(সূরা আলে ইমরান: ২০০))

 # সম্মান-মর্যাদার সুসংবাদ :

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰكُمْ.

“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছে মুত্তাকীগণ।” (সূরা হুজুরত ৪৯ : ১৩)

তাকওয়া অন্তরের এক গভীর অনুভূতির নাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বক্ষ মোবারকের দিকে ইশারা করে বলেছিলেন “আত তাকওয়া

হাহুনা”(তাকওয়া এখানেই থাকে).মুমিনের অন্তরে পবিত্রতা আর আল্লাহভীতির গুরুত্বের অনেক ফজিলত রয়েছে আমাদের জীবনে।

হাদিসে তাকওয়ার গুরুত্ব

রাসূল ﷺ বলেছেন:"তাকওয়া এখানে।"অতঃপর তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করলেন।(সহীহ মুসলিম)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে তাকওয়া কেবল বাহ্যিক আমলের নাম নয়; বরং এটি অন্তরের অবস্থা।

আরেক হাদিসে রাসূল ﷺ বলেন:"তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় করো।"(জামে আত-তিরমিযি)

উহাইব বিন ওয়ারদ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) বলেন, “আল্লাহর ভীতি হলো কোন ঘরে অবস্থানরত একজন মানুষের মত, যে ঘরটি তার মালিক যতদিন থাকে, ততদিন টিকে থাকে। আর যখনই মালিক সে ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে অবস্থান করতে শুরু করে, তখন এই ঘরটি ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহর ভীতি

ও ঠিক তাই। যতক্ষণ কোন শরীরে আল্লাহ ভীতি থাকে টি ভালো থাকে। আর যখনই সেই শরীর থেকে আল্লাহ ভীতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখনই তা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে যখন মানুষের আসরে গমন করে বলে, “লোকটি কত খারাপ!” কেউ যদি প্রশ্ন করে, “তাকে খারাপ বলার কি কারণ?” তখন তারা বলে,” কোন কারণ দেখছি না, তবে তাকে ভীষণ অপছন্দ হচ্ছে আমাদের।” এটা তার ভেতর থেকে আল্লাহভীতি হতে চলে যাওয়ার কারণে হয়েছে । আর যখন তাদের মাঝে এমন কোন লোক আসে প্রকৃতি আছে তখন তারা বলে লোকটি কত ভালো। কেউ যদি বলে, “তার মাঝে এমন কি গুন তোমরা দেখতে পেলে?” তখন তেমন কোন গুণ দেখছি না, তবে কেন যেন লোকটার প্রতি আমাদের মনে ভীষণ ভালোবাসা জন্মেছে।”(ইবনে রজব রচিত আত-তাখওয়িফ মিনার নার : পৃ:৫)

তাকওয়ার স্তরসমূহ

ইসলামী পণ্ডিতগণ তাকওয়াকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন।

- **প্রথম স্তর:** শিরক ও কুফর থেকে বেঁচে থাকা।কুফর ও শিরককে অস্বীকার ও তার থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যম হল তাকওয়া অবলম্বন করা । বান্দার উপর সর্বপ্রথম আবশ্যকীয় বিষয় হল সে আল্লাহর সাথে কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো সুন্নাহ, পন্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে সে তার রবের দ্বীন পালন করবে।
- **দ্বিতীয় স্তর:** কবিরা (বড়) গুনাহ থেকে দূরে থাকা।যা প্রকৃত পক্ষে কাম্য, তা হল এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা যা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূলের পছন্দনীয় নয়। কুরআন ও হাদীসে তাকওয়ার যেসব মর্যাদা ও কল্যাণ প্রতিশ্রুত হয়েছে তা এ স্তরের তাকওয়ার উপর ভিত্তি করেই হয়েছে।

- **তৃতীয় স্তর :**ছোট গুনাহ থেকেও সতর্ক থাকা।সগিরা গুনাহসমূহ পরিত্যাগ করার মাধ্যমেও তাকে অর্জিত হয়। কবিরা গুনাহ করার পর লজ্জা অনুশোচনা করার চেয়ে সগিরা গুনাহের উপর লজ্জিত অনুতপ্ত না হয়ে তাতে লিপ্ত থাকা অনেক খারাপ বিষয় ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তোমরা বিশেষ করে ছোট ছোট গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো,কেননা ছোট গুনাহের দৃষ্টান্ত এক জাতির মত ; যারা জঙ্গলে যায়। তখন তারা আগুন জ্বালানোর জন্য লাকড়ির প্রয়োজন অনুভব করে। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে একটি করে লাকড়ি কুড়িয়ে আনলো। একপর্যায়ে লাকড়ির স্তুপ হয়ে গেল। তারপর তারা আগুন জ্বলিয়ে নিজেদের রুটি পাকিয়ে নিলে। এভাবেই ছোট ছোট গুনাহ বান্দার উপর একত্রিত হয়। যদিও বান্দা সেগুলো বেশি গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু সেগুলো তার ধ্বংসের কারণ হয়।"(মুসনাদ আহমাদ: ৫/ ৩৩১, হদিস নং ২২৮০৮)।কারো কারো মতে সামান্য ও ছোট-খাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকেও বেঁচে থাকা। আর ইসলামী শরী'আতে এটিই তাকওয়া নামে পরিচিত।

- **চতুর্থ স্তর :**সন্দেহজনক বিষয় পরিত্যাগ করা। নিজের অন্তরকে সত্য-সঠিক তথা মহান আল্লাহ তা'আলা থেকে ফিরিয়ে রাখে এমন সকল কিছু থেকে পুত-পবিত্র থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহমুখী হওয়া।

❖ **পঞ্চম স্তর:** আল্লাহর ভালোবাসায় এমন পর্যায়ে পৌঁছানো যেখানে ব্যক্তি অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকেও দূরে থাকে।

ইমাম আল-গাযালী(রহঃ) তাকওয়ার চারটি স্তর বর্ণনা করেছেন। যথাঃ

এক- শরী'আতে যে সকল বস্তুকে হারাম করা হয়েছে, আল্লাহর ভয়ে সকল বস্তু থেকে বিরত থাকা। যেমনঃ মদ্যপান, ব্যভিচার, জুয়াখেলা ও সুদ খাওয়া প্রভৃতি হারাম কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা। এটি সাধারণ মুমিনের তাকওয়া। এ শ্রেণীর মুত্তাকীকে বলা হয় মু'মিন।

দুই- সকল হারাম বস্তুসমূহ হতে বিরত থাকার পর সন্দেহযুক্ত সকল হালাল বস্তুসমূহ হতেও দূরে থাকা। এ শ্রেণীর মুত্তাকীকে বলা হয় সালিহ।

তিন- সকল হারাম বস্তু ও সন্দেহযুক্ত হালাল বস্তুসমূহ হতে দূরে থাকার পর আল্লাহর ভয়ে অনক সন্দেহবিহীন হালাল বস্তুও পরিত্যাগ করা! এ শ্রেণীকে মুত্তাকী বলা হয় |

চার- উপরের তিন শ্রেণীর তাকওয়া আয়ত্ত করার পর এমন সকল হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা যা ইবাদাতে কোনরূপ সহায়তা করে না। এ শ্রেণীর মুত্তাকীকে বলা হয় 'সিদ্দীক!"

তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য

তাকওয়াবান ব্যক্তির মধ্যে সাধারণত নিম্নলিখিত গুণাবলি দেখা যায়:

১. আল্লাহভীতি : তিনি গোপন ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে স্মরণ করেন। আল্লাহভীতি বা খৌফ হচ্ছে তাক্বওয়ার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি আল্লাহর ভয় এবং তার অনুগ্রহের জন্য গভীর শ্রদ্ধা এবং ভয় থেকে আসে। একজন মুসলমান আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয় অনুভব করে। তিনি জানেন, আল্লাহ সর্বত্র, সর্বদা আমাদের কাজে নজর রাখেন এবং তার কাছে সঠিকভাবে হিসাব দিতে হবে। এই ভয়ই একজন মুসলমানকে তার কাজগুলো সততার সাথে, ন্যায্যতার সাথে এবং সঠিকভাবে করার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

যে পরিমাণ আল্লাহর প্রতি ফরযসমূহ আদায় করতে এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, সে পরিমাণ আল্লাহ ভীতি সবার মাঝে থাকা ওয়াজিব। ইবনুল কাইয়ুম বলেন, আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْه)কে বলতে শুনেছি,

"প্রশংসিত আল্লাহ ভীতি হলো, যা হারামে লিপ্ত হতে বাধা দেয়।" প্রকৃত আল্লাহভীতি হল গোপন ও নির্জন মুহূর্তেও আল্লাহকে

ভয় করা। যখন কোন চোখ তোমাকে দেখতে পায় না, কোনো কান তোমাকে শুনতে পায় না তখনও যদি তুমি আল্লাহকে ভয় পাও তবেই তুমি প্রকৃত আল্লাহভীরু।

২. ইখলাস (নিষ্ঠা) : তার সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়।দায়িত্বের অনুভূতি বা 'ঈমানী দায়িত্ব' একজন মুসলমানের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করা, এবং পৃথিবীতে যেসব কাজ ও কর্মকাণ্ডে একজন মুসলমান অংশগ্রহণ করেন, সেগুলোর প্রতি পূর্ণ সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ থাকা। ইসলামের মূল আদর্শগুলোর মধ্যে এমন সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে, যেন ব্যক্তি তার নিজস্ব দায়িত্ব সম্পর্কে চরম সচেতন থাকে এবং সেগুলো যথাযথভাবে পালন করতে চেষ্টা করে। সাকিব বিন ইব্রাহিম (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) বলেন, বান্দার জন্য চিন্তা ও ভয়ের চেয়ে উত্তম কোন বন্ধু হতে পারেনা আসিও গুনাহের চিন্তা আর ভয় বলতে শেষ ঠিকানা কোথায় হবে তার ভয়। আমানত রক্ষা করা, হক সমূহ আদায় করে দেওয়া,জুলুম থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি গুণাবলী মুমিনদের মাঝে আল্লাহ ভীতি থাকার লক্ষণ।

৩. সত্যবাদিতা : তিনি মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে দূরে থাকেন।যখন কেউ প্রকৃত সত্য খুঁজে পায়, তখন সেটি গ্রহণ করার মনোভাব থাকতে হবে। আল্লাহর রুহানি নির্দেশাবলী এবং ইবাদত কার্যকর করার জন্য আত্মবিশ্বাস এবং মনোবল প্রয়োজন। প্রকৃত সত্য সহজে গ্রহণ করা, কোনো ধরনের সন্দেহ বা দ্বিধাবোধ ছাড়া, আল্লাহর এককত্ব এবং তার প্রেরিত হুকুমকে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করা সত্যিকার তাক্বওয়ার লক্ষণ। যেমন, যেকোনো ইবাদত—সালাত, রোজা বা জাকাত—আল্লাহর নির্দেশনামাফিক আদায় করা।

৪. ধৈর্য : বিপদে ধৈর্য ধারণ করেন। এটি হল একজন মুসলমানের জীবনের অপরিহার্য অংশ। ফরয কাজগুলো হল আল্লাহর উপর কর্তব্য, যা প্রতিটি মুসলমানের জীবনে পালন করা জরুরি।

সালাত (নামাজ), রোজা, জাকাত, হজ—এগুলি ফরয কাজ। একজন মুসলমানের উচিত, এসব কর্তব্য নিষ্ঠা ও মনোযোগ সহকারে পালন করা। ফরয কাজগুলো আদায় করা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা করে।

৫. বিনয় : অহংকার থেকে নিজেকে রক্ষা করেন। অহংকারমুক্ত থাকা, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা | তাকওয়াশীল মানুষ অন্তরের কর্মকাণ্ডকে বিনয় করে। ফলে তার হৃদয় থেকে শত্রুতা রোধ ও অন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। সেখানে জায়গা করে নেয় মুসলিম ভাইয়ের প্রতি নসিহত ও সদুপদেশ, তার প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা। সত্যকে গ্রহণ করার পর, কঠিন পরিস্থিতি বা ত্যাগের মুখোমুখি হলেও, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সত্যের প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখাটাই আসল তাক্বওয়া।মানুষের মুখের কথাবার্তা ও ভাষায় বোঝা যায় যে সে তাকওয়াশীল কিনা। কেননা তাকওয়া মানুষকে মিথ্যা বলা, গীবত করা, অপবাদ, চোগলখুরি, অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখে । ইসলামের কিছু বিধান, যেমন হালাল-হারাম, কখনো কখনো আমাদের সমাজে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিপক্ষে হতে পারে। কিন্তু একজন তাক্বওয়া সম্পন্ন মুসলমান কখনোই আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্যুত হবে না।

৬. পরহেজগারি: আল্লাহভীতি যতটা শক্তিশালী হয়, আল্লাহর ধ্যান,আত্মপর্যালোচনা ও আমলের মেহনত ততটা শক্তিশালী হয়। আল্লাহভীতিই অন্তরে এসবের তাড়না সৃষ্টি করে। আল্লাহ ভীতি সর্বনিম্ন স্তর হল আমলে তার ছাপ পরিলক্ষিত হওয়া এবং হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা। এই স্তরের নাম পরহেজগারী। পরহেজগারী কুপ্রবৃত্তির আসক্তি থেকে বাধা দেয় তা নয় বরং সকল প্রকার নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত রাখে। পরহেজগারি তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

৭. তাকওয়া : আল্লাহর হাতে যদি পরহেজগারীর চেয়ে একটু শক্তিশালী হয় তখন বান্দা হারামের দিকে নিয়ে যায় সন্দেহ পূর্ণ বিষয়াদী ও বর্জন করেন স্তরের নাম তাকওয়া। তাকওয়া সংশয়যুক্ত বিষয় থেকে বিরত রাখে এবং সংশয় মুক্ত বিষয়ের পথে ধাবিত করে। আল্লাহ ভীতি এর চেয়ে আরো একটু উন্নত হলে তা বান্দাকে এমন সব মোবা বিষয় থেকেও বিরত রাখে যাতে সাধারণ কোন ক্ষতি নেই কিন্তু হতে পারে এমন আশঙ্কা আছে তাকওয়ায় সত্যবাদিতা। যার মাঝে এই গুণ আছে তাকে বলা হয় সিদ্দিক। তাকওয়া সত্যবাদীতার মধ্যে তাকওয়া আছে। যাদের মাঝে পূর্ণরূপে তাকওয়া বিদ্যমান, তাকওয়ায় যারা সত্যবাদী, তাদেরকে 'সিদ্দিক' ও 'মুকাররাব' তথা আল্লাহর

একান্ত নৈকট্যশীল হিসেবে অভিভূত করা যায়। আবু সুলাইমান দারানি বলেন, “যে অন্তর থেকে আল্লাহ ভীতি বিদায় নেয়, সে অন্তর বরবাদ হয়ে যায়।”সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়,আখিরাতে কামিয়াব হতে চায়, সে যেন তার অন্তরকে সবসময় লক্ষ্য অর্জনের পথে অবিচল রাখে, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। ওয়াজিব ও মুস্তাহাব আমল গুলো মনোযোগ সহকারে আদায় করে। আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত এই ভাবে জীবন যাপন করে।

তাকওয়া অর্জনের উপায়

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে পরকালের পাথেয় সংগ্রহের জন্য আদেশ দিয়েছেন। পরকালীন জীবনের জন্য সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

وَتَزَوَّدُوۡا فَاِنَّ خَيۡرَ الزَّادِ التَّقۡوٰى وَاتَّقُوۡنِ يٰٓاُولِى الۡاَلۡبَابِ

এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে আর তাক্বওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানী সমাজ! আমাকেই ভয় করতে থাক। (সূরা বাকারাহ : ১৯৭)

শায়খ কাসেমী লিখেছেন, “এটি পূর্বের পাথেয়র চেয়ে উচ্চতর কেননা পাথেয় আত্মার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত পৌঁছায় এবং পরকালের পাথেয় তার নিয়ামত পর্যন্ত পৌঁছায়।” যে কেয়ামত দিবসে স্বচ্ছ ঈমান, নেক আমল নিয়ে আসবে এবং তার নেক আমল তার বদ আমল থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। সুতরাং সে সফলকাম ও সৌভাগ্যবান হবে।তাকওয়া অর্জন একদিনের কাজ নয় বরং এটি ধারাবাহিক সাধনা আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

- ***বিশুদ্ধ ঈমান ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা :*** তাকওয়ার ভিত্তি হলো দৃঢ় ঈমান। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস, তাঁর গুণাবলির প্রতি আস্থা এবং আখিরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি মানুষকে তাকওয়ার পথে পরিচালিত করে।

  আল্লাহ তাআলা বলেন:

  يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ١٠٢

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কক্ষনো মরো না। (সূরা আলে ইমরান: ১০২)

- যার ঈমান যত শক্তিশালী, তার তাকওয়াও তত বেশি দৃঢ় হয়।

❖ ***কুরআন তিলাওয়াত, অধ্যয়ন ও আমল :*** কুরআন হলো তাকওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। শুধু তিলাওয়াত নয়, এর অর্থ বুঝে জীবনে বাস্তবায়ন করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য **আল্লাহ ﷻ বলেন:**

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

"এটি এমন এক কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই; মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ।" (সূরা আল-বাকারা: ২)

করণীয়:

- প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করা।
- তাফসীর অধ্যয়ন করা।
- শেখা বিষয়গুলো জীবনে প্রয়োগ করা।

❖ ***নিয়মিত সালাত আদায় :*** সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে দূরে রাখে এবং আল্লাহর স্মরণে রাখে। **আল্লাহ বলেন:**

"নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আল-আনকাবুত: ৪৫)

❖ **তাকওয়া বৃদ্ধিতে সালাতের ভূমিকা:**

- আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে।
- আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়।
- গুনাহ থেকে দূরে রাখে।

❖ ***রোযা পালন :*** রমযানের রোযার অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো তাকওয়া অর্জন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:"তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে... যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

রোযা মানুষের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায় এবং আত্মসংযম বৃদ্ধি করে।

- **অধিক যিকির ও দোয়া করা :** আল্লাহর স্মরণ অন্তরকে জীবিত রাখে এবং গুনাহ থেকে দূরে রাখে।

গুরুত্বপূর্ণ যিকির:

- سبحان الله
- الحمد لله
- لا إله إلا الله
- الله أكبر
- أستغفر الله

তাকওয়ার জন্য দোয়া:

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমার নফসকে তার তাকওয়া দান করুন এবং তাকে পবিত্র করুন; আপনিই সর্বোত্তম পবিত্রকারী।"

- ***গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা :*** তাকওয়ার মূল অর্থই হলো আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করা।ছোট গুনাহকেও তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়, কারণ ছোট গুনাহ জমতে জমতে বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

বিশেষভাবে বর্জনীয়:

- মিথ্যা বলা গীবত করা
- সুদ ঘুষ

- হারাম উপার্জন অশ্লীলতা
- অহংকার

- ***আত্মসমালোচনা (মুহাসাবা) :*** প্রতিদিন নিজের কাজের হিসাব নেওয়া তাকওয়া বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

নিজেকে প্রশ্ন করা:

- আজ আমি কী ভালো কাজ করেছি?
- কোন গুনাহ করেছি?
- আল্লাহর কোন হুকুম পালন করতে পারিনি?

হযরত উমর (রা.) বলেছেন:

"নিজেদের হিসাব নাও, তোমাদের হিসাব নেওয়ার আগে।"

❖ ***সৎ ও নেককার মানুষের সঙ্গ গ্রহণ :*** মানুষ তার সঙ্গীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের উপর থাকে।"

সৎ সঙ্গ:

- ইবাদতের আগ্রহ বাড়ায়।
- গুনাহ থেকে দূরে রাখে।
- ইসলামী জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে।

❖ **মৃত্যুর কথা ও আখিরাত স্মরণ**

মৃত্যুর স্মরণ মানুষকে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত করে এবং আল্লাহমুখী করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করো।"

যখন মানুষ কবর, হাশর, হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করে, তখন তার অন্তরে তাকওয়া বৃদ্ধি পায়।

❖ **ইলম অর্জন**

ইসলামী জ্ঞান মানুষকে হালাল-হারাম সম্পর্কে সচেতন করে।

আল্লাহ বলেন: "আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই যথার্থ ভয় করে।" (সূরা ফাতির: ২৮)

জ্ঞান ছাড়া তাকওয়া পরিপূর্ণ হয় না।

❖ **নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম (মুজাহাদা)**

নফস সবসময় খারাপ কাজের দিকে আহ্বান করে। তাকওয়া অর্জনের জন্য নফসের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়।

উদাহরণ:

- রাগ নিয়ন্ত্রণ করা।
- দৃষ্টিকে সংযত রাখা।
- হারাম আকাঙ্ক্ষা দমন করা।
- অলসতা পরিহার করা।

❖ **আল্লাহর নেয়ামত ও পর্যবেক্ষণ অনুভব করা**

সর্বদা মনে রাখা যে আল্লাহ সবকিছু দেখছেন, শুনছেন এবং জানেন।এই অনুভূতিকে **মুরাকাবাহ** বলা হয়। যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে আল্লাহ তাকে দেখছেন, তখন সে গোপন ও প্রকাশ্য উভয় অবস্থায় গুনাহ থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে।

তাকওয়া অর্জনের জন্য ঈমানকে মজবুত করা, কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করা, নিয়মিত ইবাদত করা, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, আত্মসমালোচনা করা, সৎ সঙ্গ গ্রহণ করা এবং আখিরাতকে স্মরণ করা অপরিহার্য। তাকওয়া কোনো বাহ্যিক পরিচয় নয়; এটি অন্তরের এমন একটি গুণ, যা মানুষের চরিত্র, আচরণ ও জীবনব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়। যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ, সম্মান, শান্তি এবং সফলতার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।

সামাজিক জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তাকওয়া হলো আল্লাহভীতি, আত্মসংযম এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মানসিকতা। একজন ব্যক্তি যখন তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হয়, তখন তার ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি সমাজজীবনেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। তাকওয়াভিত্তিক সমাজে ন্যায়, শান্তি, সৌহার্দ্য ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১. সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণের প্রধান উপকরণ : একটি সমাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু, পুত-পবিত্র, পরিশুদ্ধ সর্বপরি সমৃদ্ধশালী করতে হলে ইসলামী আখলাকের প্রধান গুণ তাকওয়া একান্ত প্রয়োজন। একজন তাকওয়াবান মুমিনের জীবনে সুনাগরিকের সকল গুণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অবশ্য তাকওয়াবান মানুষ না হলে, একটি সুন্দর, শান্তিময় সমাজ গড়ে তোলা যায় না। তাই সমাজের সকল সদস্যকে তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করা অপরিহার্য।

২. সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে তাকওয়া : সামাজিক জীবনে সামাজিক মূল্যবোধে তাকওয়া অপরিহার্য তাকওয়া সমাজের মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। তাই একজন তাকওয়াবান মানুষ কখনও অপরের অধিকার হরণ করে না, অপরকে কষ্ট দেয় না, অন্যায়-অনাচার থেকে নিজে বেঁচে থাকে, সমাজকে এ থেকে বাঁচায়।

সমাজের অনিষ্ট ও অকল্যাণ হয় এমন কাজ তার দ্বারা হয় না। তাকওয়া মানুষের মধ্যে দয়া, সহানুভূতি, সততা, বিনয় ও পরোপকারের মতো গুণাবলি সৃষ্টি করে, যা একটি আদর্শ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. সামাজিক শৃঙ্খলায় তাকওয়া : সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় তাকওয়া একান্ত অপরিহার্য। কেননা তাকওয়াবান মানুষ তার কাজ-কর্মে আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান। আর আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে সমাজের সদস্যগণ যদি দায়িত্ব পালন করেন, তবে সে সমাজ অবশ্যই শান্তি ও শৃঙ্খলাময় হতে বাধ্য। তাকওয়া মানুষের মধ্যে সহনশীলতা, ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা সৃষ্টি করে। মানুষ যখন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়িত্বশীল হয়, তখন ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা ও সংঘাত কমে যায়। এর ফলে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তাকওয়া : সামাজিক ন্যায়বিচার ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য তাকওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় গুণ। তাকওয়াবান মানুষ সমাজে কখনো ন্যায়-নীতির বিপরীত কোন কাজ হতে দেয় না এবং সেও করে না। আল্লাহ বলেন : "তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কর। কেন না ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা তাকওয়ার খুব নিকটবর্তী। (সূরা -আল মায়িদাহ : ৮)।

৫. তাকওয়াবান ব্যক্তি সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার চেষ্টা করে। সে অন্যের অধিকার হরণ করে না এবং বিচার-আচরণে পক্ষপাতিত্ব করে না। ফলে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানুষের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি পায়।

৬. দুর্নীতি ও অপরাধ হ্রাস : তাকওয়া মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে। একজন তাকওয়াবান ব্যক্তি জানে যে তার প্রতিটি কাজের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে। এই জবাবদিহিতার অনুভূতি তাকে ঘুষ, চুরি, প্রতারণা, মিথ্যাচার ও অন্যান্য অপরাধ থেকে দূরে রাখে। ফলে সমাজে অপরাধ ও দুর্নীতির পরিমাণ কমে যায়।

৭. সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা : তাকওয়া মানুষের মধ্যে সহনশীলতা, ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা সৃষ্টি করে। মানুষ যখন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়িত্বশীল হয়, তখন ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা ও সংঘাত কমে যায়। এর ফলে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক নিরাপত্তা, পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টির জন্য তাকওয়া অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। তাকওয়াবিহীন সমাজে সামাজিক আস্থা ও নিরাপত্তা গড়ে উঠে না।

৮. সামাজিক সাম্য, সম্প্রীতি ও সংহতিতে : সামাজিক সাম্য, সম্প্রীতি ও সংহতি সৃষ্টিতে তাকওয়ার বিকল্প নেই। তাকওয়া বা আল্লাহভীতি মানুষের মনে অপর মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা-স্নেহ সৃষ্টি করে। মানুষে মানুষে সাম্য, সম্প্রীতি ও সংহতি গড়ে তোলে। যাবতীয় ভেদ-বৈষম্য ও পার্থক্য দূরীভূত করে আল্লাহর বান্দা হিসেবে সকলে মিলেমিশে জীবনযাপন

করে। ইসলাম সকল মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে শিক্ষা দেয়। তাকওয়া মানুষের মধ্যে জাতি, বর্ণ, ভাষা ও সামাজিক অবস্থানের ভেদাভেদ দূর করে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে। ফলে সমাজে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯. আত্ম-সামাজিক উন্নয়নে তাকওয়া : আত্ম-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তাকওয়া একটি বড় গুণ। যদি সমাজের লোকদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ থাকে, তবে সমাজের সদস্যরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সমাজের আত্ম-সামাজিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষতার জন্য কাজ করে থাকে। আর দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মূল উৎস হচ্ছে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি। তাই আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির জন্য তাকওয়াবান হওয়া অপরিহার্য।

তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ। আর যে সমাজের মানুষের মধ্যে এ গুণ অর্জিত হয়, সে সমাজ হয় সুখী সমৃদ্ধশীল। তাকওয়াবান মানুষ কখনও ব্যক্তি ও সমাজকে ফাঁকি দেয় না। তাই মানুষ ব্যক্তি জীবনে যেমন হয় সৎ, তেমনি সমাজ জীবনে হয় কর্তব্যনিষ্ঠ। এ জন্য সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠা একমাত্র তাকওয়া দ্বারাই সম্ভব।

তাকওয়া একটি আদর্শ সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এটি মানুষের চরিত্রকে উন্নত করে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে, অপরাধ ও দুর্নীতি কমায় এবং সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতি নিশ্চিত করে। তাই ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তাকওয়ার চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি তাকওয়াভিত্তিক সমাজই হতে পারে নৈতিকতা, মানবতা ও কল্যাণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুনাগরিকতার প্রধান গুণ-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। আর তাকওয়া থেকেই নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগরিত হয়। তাকওয়াবান ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেনে সততা বজায় রাখে। সে প্রতারণা, সুদ, ঘুষ ও অসাধু উপায়ে সম্পদ অর্জন থেকে বিরত থাকে। এর ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

তাকওয়ার ফজিলত

তাকওয়ার ফজিলত কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। কোন বিষয় ফজিলতপ্রাপ্ত হয়, যখন সেটি আখিরাতে সফলতা অর্জনে কী পরিমান ভূমিকা রাখে তার উপর ভিত্তি করে। তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি ফজিলতপূর্ণ না হয়ে উপায়ই বা কি! এর মাধ্যমে নিষ্কলুষতা অর্জিত হয়, অর্জিত হয় তাকওয়া পরহেজগারি ও নেক আমলের প্রেরণা।আর এসব গুনগুলো ফজিলতপূর্ণ ও প্রশংসনীয় আমল, যা বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্যশীল করে।

দুনিয়ার স্বাদ-উপভোগ পরিত্যাগ করা তখনই সম্ভব যদি আসক্তিকে দমন করা যায়। আর আল্লাহভীতির দ্বারা যেভাবে আসক্তি দমন করা যায়, তা অন্য কোন কিছু দ্বারা যায় না। আল্লাহভীতিই আসক্তি দমন করার কার্যকর উপায়।

তাকওয়ার বরকতসমূহের মধ্যে একটি হলো বান্দা এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট সম্মানিত হয়ে যায়। তাকওয়ায় যে পরিমাণ উন্নত হবে সে পরিমাণ আল্লাহর কাছে তার স্থান ও মর্যাদা বাড়বে। হাফিজ ইবনে কাসির লিখেছেন যে, মহান আল্লাহর নিকট একে অপর থেকে তোমাদের স্থানের উচ্চতা তাকওয়ার কারণে হবে বংশাবলির কারণে নয়। [তাফসীর ইবনে কাসীর: ৪/২২৮]

ইমাম বুখারী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

"قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَتْقَاهُم"

জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল,মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানী কে? তিনি বললেন, সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী যে। [বুখারী: ২৫৩, ৬/৩৮৭]

ইমাম তিরমিজী এবং ইমাম ইবনে মাজাহ সামুরা বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বংশাবলি হলো সম্পদ এবং সম্মানের মাধ্যম হলো তাকওয়া। আল্লাহ তাআলা আল্লাহভীরুদের জন্য তার হিদায়াত, রহমত, ইলম ও সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। যার প্রত্যেকটি জান্নাতবাসীদের জন্য মর্যাদার একেকটি স্তর।

তাকওয়ার বিশাল লাভসমূহের মাঝে একটি হলো, তা বান্দাকে আল্লাহর বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত করার অন্যতম মাধ্যম। এ কথার প্রমাণে দুটি দলিল উল্লেখ করা হলো—-

মহান আল্লাহ বলেন,

والله ولي المتقين

“ এবং আল্লাহ মুত্তাকিদের বন্ধু। ”(সূরা আল-জাসিয়া: ১৯)

মহান আল্লাহ বলেন,

اَوۡلِيَآؤُهٗۤ اِلَّا الۡمُتَّقُوۡنَ وَلٰـكِنَّ اَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ٣٤

“তার আল্লাহর বন্ধুত্ব কেবল মুত্তাকীগণে কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা অবগত নয়।”(সূরা আনফাল:৩৪)

মহান আল্লাহর বন্ধু হওয়া অনেক লাভ ও বরকতের বিষয়। সূরা ইউনুসে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَاۤ اِنَّ اَوۡلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ۚ ۖ ٦٢ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَكَانُوۡا يَتَّقُوۡنَ ؕ ٦٣ لَهُمُ الۡبُشۡرٰى فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَفِى الۡاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبۡدِيۡلَ لِـكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰ لِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ؕ ٦٤

“জেনে রেখ! আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না। যারা ঈমান আনে আর তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে আর আখেরাতেও। আল্লাহর কথার কোন হেরফের হয় না, এটাই হল বিরাট সাফল্য।”

উপরে উল্লেখিত আয়াত সমূহে যেসব দান ও অনুগ্রহে আল্লাহর বন্ধুরা ধন্য হবে সেগুলো হলো-

১.তাদের কোন আশঙ্কা নেই

২. তারা বিষন্ন হবেনা

৩. পার্থিব জীবনে সুসংবাদ

৪. পরকালের সুসংবাদ

৫.বিরাট সাফল্য অর্জনের সাক্ষ্য

৬. তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর যুদ্ধ ঘোষণা

তাকওয়ার মাহাত্ম্যপূর্ণ বরকতসমূহের মধ্যে একটি হলো, মুত্তাকী ব্যক্তিরা রাসূল সাঃ এর বন্ধু হওয়ার সুমহান মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহভীতি একটি ভালো গুণ। আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা ও একটি ভালো গুণ। ঠিক এই গুণগুলো যদি মানুষের জন্য হয়, যেমন: মানুষকে ভয় পাওয়া, মানুষের জন্য কাউকে ভালোবাসা, তখন সেগুলো মন্দ বিষয়। মানুষ যখন কাউকে ভয় পায়, তখন তার সাক্ষাৎ কেউ ভয় পায়। বরং তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করে। কিন্তু আল্লাহকে ভয় পাওয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টি পুরোপুরি উল্টো। এজন্যই আমরা দেখি যে, মানুষ যখন তার সৃষ্টিকর্তাকে ভয় পায়, তখন তার আনুগত্যে ফিরে আসে এবং তার কাছে আশ্রয় খোঁজে। নিচের আয়াত থেকে বোঝা যায়:

ففروا الى الله

"অতএব আল্লার দিকে ধাবিত হও।"(সূরা আজ-জারিয়াত :৫০)

ইবনে আব্বাস বলেন, "গুনাহ থেকে তওবা করার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ধাবিত হও এবং তার অনুগত হয়ে আমল কর।"

নেককার ও মুত্তাকীদের কর্ম ছিল আশ্চর্যজনক। তারা আমলের ময়দানে মুজাহাদা করতেন। প্রতিটি সেকেন্ডকে মূল্য দিতেন। এ সবের মাঝে আবার থাকত ইখলাস ও সততার সুবাস, থাকতো না কৃত্রিমতা ও লৌকিকতার দুর্গন্ধ। মুহাম্মদ বিন ওয়াসি (রাদিয়াল্লাহু) বলেন, "যদি প্রকৃত মুত্তাকী ব্যক্তি ২০ বছর পর্যন্ত ক্রন্দন করে, তবুও তার পাশে থাকা স্ত্রী তা টের পায় না।"

তাকওয়ার বিশাল বরকতসমূহের আরেকটি অন্যতম বিষয় হলো, মহান আল্লাহ স্বীয় সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে মুত্তাকিদের সঙ্গে থাকেন।যে সব আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ :

মহান আল্লাহ বলেন,

واتقوا الله واعلم ان الله مع المتقين

"এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং জেনে নাও যে, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা বাকারা: ১৯৪)

শায়খ সাদি লিখেছেন, মহান আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি সাহায্য, সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তাওফিক প্রদানের মাধ্যমে মুত্তাকী লোকদের সাথে রয়েছেন। আর যার সাথে আল্লাহ থাকবেন সে সবসময় সুখ ও উন্নতি লাভে ধন্য হবে। আর যে তাকওয়া বর্জন করবে আল্লাহ তার থেকে বিমুখ হয়ে যান, তাকে তার আত্মাকে সমর্পণ করে দেন,এবং তার ধ্বংস কন্ঠনালী থেকেও অধিক নিকটবর্তী হয়ে যায়। [তাফসীরুস সাদী :৭৯)

তাকওয়াই হলো ইবাদতের মূল ভিত্তি।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন , "তুমি আল্লাহকে ভয় করো। যেন সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী হতে পারো।"

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করলেও অন্তরে তাকওয়ার সৃষ্টি হয়। এই দুনিয়াতে তার সত্তার ওপর প্রমাণবহন করে এরকম ফ্রমান অনেক রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সূর্যকে আলো দেয়ার জন্য বানিয়েছেন,চাঁদকে চমকানোর মাধ্যম বানিয়েছেন। চাঁদ -সূর্যের অবস্থানস্থল ও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যাতে আমরা দিন,

মাস ও বছরের হিসাব রাখতে পারি। এভাবে আল্লাহ রাত ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং একটি অপরটি থেকে বের করেছেন। কখনো দিন বড় হয় আবার কখনো রাত বড় হয়। তার কুদরতে অসংখ্য বড় বড় নিদর্শন রেখেছেন।তিনি এই দুনিয়া অহেতুক সৃষ্টি করেননি। আদম সন্তানের জন্য যেন এবাদতের জায়গা হয়ে যায় সেজন্যই তিনি এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন। আর এই দুনিয়ায় আল্লাহতায়ালা সর্বশেষ সৃষ্ট ও সৃষ্টির পরিসমাপ্তি নয়, এই দুনিয়ার জীবনের পর আরেকটি জীবন রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে মৃত্যুর

পর আবার জীবিত করে উঠাবেন। হাশরের মাঠ কায়েম করবেন।আমরা দুনিয়াতে যেসব আমল করেছি তার পরিপূর্ণ প্রতিদান সেদিন আমাদেরকে দেয়া হবে। মুত্তাকিদের জন্য মহাপুরষ্কারের বর্ণনা মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে বলেছেন,

وَاِنۡ تُؤۡمِنُوۡا وَتَتَّقُوۡا فَلَـکُمۡ اَجۡرٌ عَظِیۡمٌ

“এবং তোমরা ঈমান আনলে এবং সাবধান(পরহেজগার) হয়ে চললে,তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরষ্কার।”(সূরা আল-ইমরান : ১৭৯)

আল্লামা শাওকানি স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, এর না তো পরিমাণ জানা আছে, আর না এর বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব । (ফাতহুল কাদীর:১/৬০৮)

মহান আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ফুরকান ও নুরের (ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি ও আলো) মহা নিয়ামত দান করেন। এ বিষয়ে দুটি আয়াতে তিনি বলেছেন :

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ تَتَّقُوا اللّٰهَ یَجۡعَلۡ لَّـکُمۡ فُرۡقَانًا وَّیُکَفِّرۡ عَنۡکُمۡ سَیِّاٰتِکُمۡ وَیَغۡفِرۡ لَـکُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الۡفَضۡلِ الۡعَظِیۡمِ

“ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি প্রদান করবেন, তোমাদের দোষ-ত্রুটি দূর করে দিবেন, তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।”(সূরা আনফাল: ২৮)

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوۡا بِرَسُوۡلِهٖ یُؤۡتِکُمۡ کِفۡلَیۡنِ مِنۡ رَّحۡمَتِهٖ وَیَجۡعَلۡ لَّـکُمۡ نُوۡرًا تَمۡشُوۡنَ بِهٖ وَیَغۡفِرۡ لَـکُمۡ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ۚۙ

হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন আর তিনি তোমাদের জন্য আলোর ব্যবস্থা করবেন যা দিয়ে তোমরা পথ চলবে, আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (সূরা আল হাদীদ :২৮)

গাজওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,"আমার উপর আল্লাহর হক হলো, আমি যতদিন হাসবো না, যতদিন না আমি জেনে যাই, দুই আবাসস্থলের (জান্নাত ও জাহান্নামের) মধ্যে কোনটি আমার আবাস।" হাসান রাদিয়াল্লাহু বলেন, "তিনি যা বলেছেন ঠিক তাই করেছেন। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে কখনো হাসতে দেখা যায়নি।"

সালাম বিন আবু মুতি রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "এক রাতে আমি মালিক বিন দিনার রাঃ কাছে গেলাম। তিনি তখন চেরাগহীন একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং হাতে একটি রুটি নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছিলেন। আমি বললাম,"আবু ইয়াহইয়া, আপনার কাছে কি চেরাগ নেই? রুটি রাখার মত কোন পাত্র কি নেই?" তিনি বললেন, ছাড়ো এসব বিষয়! এসবে মাথা ঘামানোর সময় কোথায়?আমি তো আমার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত।"

তাদের অবস্থা এমন হওয়ার কারণ হলো, তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং মৃত্যুর পর অবশ্যই হিসাব নিকাশ হবে।ছোট বড় কোন বিষয়ই হিসাব থেকে বাদ পড়বে না। বান্দার জন্য তাকওয়াকে আঁকড়ে ধরার মতো উপকারী কোন আমল নেই। তাই আল্লাহ তায়ালার রাসূল, এমনকি সাহাবা, তাবেঈন, আইম্মায়ে দীন এবং সালাফে সালেহীনগণ ঈমানদারদেরকে তাকওয়ার অলংকারে অলংকৃত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল মানুষকে আল্লাহ তাআলা তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ

"বস্তুত আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে,তোমরা সকলে আল্লাহকে ভয় করতে থাক।"(সূরা নিসা: ১৩১)

তাকওয়ার বিশাল বরকতসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় হল, মহান আল্লাহ তাদের দুঃখ থেকে নিষ্কৃতির পথ বের করে দেন এবং ধারণাতীত উৎস থেকে রিজিক দান করেন। বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক বলেন,

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ- وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ

"আর যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতি পথ বের করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিজিক দান করবেন।"(সূরা আত-তালাক : ২-৩)

মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَـفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰـكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

জনপদগুলোর লোকেরা যদি ঈমান আনত আর তাক্বওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান আর যমীনের কল্যাণ উন্মুক্ত করে দিতাম কিন্তু তারা (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করল। কাজেই তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (সূরা আল- আরাফ: ৯৬)

এ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন যে, যদি জনপদের অধিবাসীদের মধ্যে ঈমান ও তাকওয়া চলে আসে,তাহলে তাদের জন্য কল্যাণ ব্যাপক করে দিবেন এবং তা তাদেরকে চতুর্দিকে থেকে সুলভ হবে।

আল্লাহভীতির আলামত

যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে, সবর করে, নেক আমল করে এবং হারাম বিষয়াদি পরিত্যাগ করে তার আমল কে নষ্ট করবেন না। তিনি অবশ্যই নিয়ামত প্রাপ্ত হবেন। যে ব্যক্তি সবর করে না, সে ইবাদতসমূহকে তার হকসহ আদায় করতে পারেনা। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও করতে

পারেনা।আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুত্তাকী ও ধৈর্যশীল বান্দাদেরকে শত্রুর মোকাবেলায় অবশ্যই সাহায্য করেন। এ বিশ্বে মহান আল্লাহর সুন্নত হল যে, প্রশংসাযোগ্য এবং সর্বোত্তম পরিণাম শুধু মুত্তাকী লোকদের জন্য। এখানে আলামত ও লক্ষণ তুলে ধরছি, যেগুলোর মাধ্যমে বান্দা নিজেকে চিনতে পারবে -সেকি আল্লাহভীরুদের অন্তর্ভুক্ত আছে, না গাফিল ও উদাসীন লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

১। ইবাদতের ব্যাপারে ভয় হওয়া। সে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করে। কৃত্রিমতা ও কপটতা থেকে বিরত থাকে।

২। অন্তর সম্পর্কিত সব বিষয়ের ব্যাপারে ভয় করা। তার অন্তর থেকে শত্রুতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার বিদায় নেয়। তার অন্তরে কল্যাণকামিতা ও মুসলমানদের প্রতি মহাব্বত জায়গা করে নেয়।

৩। জিহ্বায় আল্লাহভীতি প্রকাশ পাওয়া। সে মিথ্যা, গীবত ও অহেতুক কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং জিহ্বাকে আল্লাহর জিকির, কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনের আলোচনায় মশগুল রাখে।

৪। দৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে ভয় পাওয়া। সে নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না এবং আগ্রহ নিয়ে চোখ দিয়ে দুনিয়াকে দেখে না। বরং শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে দৃষ্টি নিয়ে দুনিয়াকে দেখে।

৫। হাত সম্পর্কিত বিষয়ে ভয় পাওয়া। সে হারামের দিকে হাত প্রসারিত করে না। সে কেবল আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের দিকেই হাত বাড়ায়।

৬। বা সম্পর্কিত বিষয় ভয় পাওয়া। সে গুনাহের জন্য পা বাড়ায় না। নিজেকে সংযত করে।

৭। পেট সম্পর্কিত বিষয়ে ভয় পাওয়া। সে হালাল ব্যতীত অন্য কোনো খাবার গ্রহন করে না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার গ্রহন করে না।

এই সকল গুণ যার মাঝে পাওয়া যায়, সে ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

وَزُخْرُفًا ۚ وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

“আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যই, যারা ভয় করে।”

যারা নেক আমল করে তাদের জন্য কিছু বিষয়কে ভয় পাওয়া জরুরী। সুতরাং যারা বদ আমল করে তাদের জন্য ভয় পাওয়া কতটা জরুরি, তা সহজেই বুঝা যায়।

১। ইবাদত কবুল না হওয়ার ভয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

إنما يتقبل الله من المتقين

“ আল্লাহ মুত্তাকীদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন।”(সূরা আল-মায়িদা: ২৭)

২। রিয়া বা লোক দেখানোর ভয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء

“তাদেরকে এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, দ্বীনকে কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে একনিষ্ঠভাবে তারা আল্লাহর ইবাদত করবে।”(সূরা আল-বাইয়িনাহ: ৫)

৩। ইবাদতে ব্যর্থ হওয়ার ভয়। কেননা এ কথা জানা নেই যে, বান্দাকে ইবাদতের তৌফিক দেওয়া হবে, কি হবে না। কারণ তৌফিক একমাত্র আল্লাহর হাতে।

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه انيب

“আল্লাহর মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তার ওপরেই নির্ভর করি এবং তারই দিকে ফিরে যাই।”(সুরা আল- ইহইয়া: ১৬)

৪। নেক আমল কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখার ভয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

“যে সৎকর্ম নিয়ে আসবে সে তার ১০গুণ পাবে।”(সূরা আল-আনআম: ১৬০)

তাকওয়ার উপকারিতা

১। দুনিয়াবী উপকারিতা :

যারা আল্লাহকে ভয় করে, দুনিয়াতে ও তারা অনেক পুরস্কারে ভূষিত হবে। তাকওয়ার ফলে আসমান ও জমির বরকত দুনিয়াবাসীর জন্য উন্মুক্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও জমিন থেকে বরকত সমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম। (সূরা আরাফ: ৯৬)

মানুষ তাকওয়া অর্জনের ফলে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম হয় এবং তা বুঝার তাওফিক লাভ করে। আল্লাহ বলেন, “হে মুমিনগণ যদি তোমার আল্লাহকে ভয় করো তাহলে ফুফুরকান প্রদান করবেন।” (সূরা ফুরকান: ২৯)

ফুরকান অর্থ হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করার জ্ঞান।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, “ যে আল্লাহকে ভয় করে,তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না ।”(সূরা তালাক : ২-৩)

তাকওয়ার ফলে পার্থিব জীবনে আল্লাহ মানুষের কাজগুলো সহজ করে দেন, তাদের জরুরী প্রয়োজন সহজে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

“যে আল্লাহকে ভয় করে,তিনি তার কাজ তার কাজকে সহজ করে দেন।”(সূরা তালাক: ৪)

তাকওয়ার ফলে আল্লাহর বান্দাগণ মুসিবত ও সীমালঙ্ঘনতা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনের পরস্পরের সহযোগিতা করো না।"(সূরা মাজেদা: ২)

তাকওয়া অর্জনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নির্দশনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

"এটাই হলো আল্লাহর বিধান:যে আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে সম্মান করবে,নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই।"(সূরা হাজ্জ :৩২)

তাকওয়ার দ্বারা পার্থিব জগতে মানুষ আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জন করে। কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللهُ وَلِىُّ الْمُتَّقِيْنَ

"আর নিশ্চয়ই জালিমরা মূলত একে অপরের বন্ধু এবং আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু।"(সূরা জাসিয়া : ১৯)

তাকওয়ার ফলে ইলম ও জ্ঞান অর্জন হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَ اتَّقُوا اللهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ۗ

"আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন।"(সূরা বাকারা : ২৮২)

তাকওয়া দ্বারা আল্লাহর রহমত লাভ হয়। এ রহমত যেরূপ দুনিয়াতে লাভ হয়, তেমনি আখেরাতেও লাভ হবে। তাকওয়ার ফলে বান্দার আমল বিশুদ্ধ হয় এবং গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং পাপ মোচন হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۗ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ ١٥٦

"আর আমার রহমত সব বস্তুকে পরিব্যপ্ত করেছে। সুতরাং আমি তা লিখে দিব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত প্রদান করে। আর যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে।"(সূরা আরাফ: ১৫৬)

২. **আখিরাতের উপকারিতা :**

তাকওয়ার ফলে বান্দার আখিরাতে জান্নাতের মিরাস ও উত্তরাধিকার লাভ হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

“সেই জান্নাত, আমি যার উত্তরাধিকারী বানাবো আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যারা মুত্তাকী।”(সূরা মারইয়াম: ৬৩)

আখিরাতে তাকওয়া বান্দার গুনাহের কাফফারা হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا

“আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন এবং তার প্রতিদানকে মহান করে দেন।”(সূরা তালাক: ৫)

কিয়ামতের দিন তাকওয়ার ফলে আল্লাহর শাস্তি থেকে নাজাত মিলবে। এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

“আর তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হবে রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পর আমি এদেরকে মুক্তি দেব তাকওয়া অবলম্বন করেছে নানিদেরকে আমি সেখানে রেখে দেবো নতজানু অবস্থায়।”(সূরা মারিইয়াম: ৭১-৭২)

তাকওয়ার ফলে আখিরাতে জান্নাত লাভ হবে, কারন জান্নাত মুত্তাকীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَسَارِعُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَۙ ١٣٣

“আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে,যার পরিধি আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।”(সূরা আলে ইমরান :১৩৩)

আখিরাতের মুত্তাকিদেরকে তাকওয়ার কারণে তাদের নেকি ও প্রতিদান বহুগুণে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْؕ

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন, তোমাদেরকে নূর দেবেন যার

সাহায্যে তোমরা চলতে পারবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।" (সূরা হাদীদ :২৮)

আখেরাতে মুক্তাকিদের জন্য আল্লাহর নিকট তাদের তাকওয়া অনুপাতে বিভিন্ন আসন থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرٍ ٥٤ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ

"নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে। যথাযোগ্য আসনে, সর্বশক্তিমান মহাঅধিপতি নিকটে।" (সূরা কামার : ৫৪-৫৫)

তাকওয়ার ফলে কিয়ামতের দিন মুত্তাকিদের অভিযাত্রী দল হিসেবে উপস্থিত করা হবে। তারা

বাহনে চড়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে,এরাই সর্বোত্তম অভিযাত্রী । আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ۝

"সেদিন পরম করুনাময়ের নিকট মুত্তাকিদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব।"(সূরা মারিয়াম :৮৫)

তাকওয়া ও আশা

আশা ও ভয় - এক পাখির দুটি ডানা যেগুলোর সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দারা মাহমুদ উড়াল দেয়। আশা ও ভয় এমন দুটি বাহন, যে দুটির উপর সাওয়ার হয়ে তারা আখিরাতের পথে ছুটে চলে, যে পথের পদে পদে রয়েছে কঠিন বাধা।আশার লাগাম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য ও জান্নাতের শান্তি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে না। আর ভয় ব্যতীত অন্য কিছু জাহান্নামের আগুন ও কঠিন আজাবকে রুখতে পারে না। (সূরা আল ইয়াহিয়া :১৪৯)

ভয় ও আশার ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। অনেক সময় এসব দেখে কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায় যে, এই দুটির মধ্যে কোনটি বেশি উত্তম। ভয়ও আশা এ দুটি দ্বারা অন্তরের চিকিৎসা করা হয়। তাই এ দুটির ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে বান্দার অন্তরে রোগের উপর।

কেউ যদি আল্লাহর অসীম রহমত ও ক্ষমার দিকে তাকিয়ে প্রবঞ্চিত হয় এবং আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবে তবে তার জন্য ভয় উত্তম। আর যদি কারো

অন্তরে ও মাগফিরাতের ব্যাপারে নৈরাশ্যের রোগ থাকে, তবে তার জন্য আশা উত্তম। অনুরূপভাবে বান্দার মাঝে যদি গুনাহের প্রবণতা থাকে, তাহলে তার জন্য ভয়ই উত্তম। তবে প্রয়োজনীয়তার বিচারে ভয়কে আশার চেয়ে উত্তম বলা হয়। কারন মানুষের মাঝে গুনাহ ও নাফরমানী প্রবণতা বেশি।

যার সমাধান হলো - তাকওয়া (আল্লাহর ভয়)। তাই ভয়ের প্রয়োজন যেহেতু আশার চেয়ে বেশি,সাধারণভাবে ভয় আশার চেয়ে উত্তম।

উৎসমূলের বিচারে ভয়ের চেয়ে আশা বেশি উত্তম। কেননা আশার উৎসমূল হলো রবের রহমত ও মাগফিরাত। আর ভয়ের উৎসমূল হলো তার ক্রোধ। যে ব্যক্তি আল্লাহর মেহেরবানী, দয়া ও গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য করে, তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর ভালোবাসা হলো আল্লাহর নৈকট্যের সর্বোচ্চ স্তর। অন্যদিকে ভয়ের ভিত্তি হল ক্রোধবিষয়ক গুণাবলী। আর প্রেমের সাথে যে মিল আশার সাথে আছে, তা ভয়ের নেই।

ইবনুল কাইয়ুম (র:) আল্লাহর ফজিলত সম্পর্কে বলেন, "ভয় আল্লাহর পথের পথিকদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মঞ্জিল এবং কলবের জন্য সর্বাধিক উপকারী। এটা সবার জন্য ফরজ। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

فَلَا تَخَافُوۡهُمۡ وَخَافُوۡنِ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ

"সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তবে আমাকে ভয় কর।"(সূরা আল ইমরান :১৭৫)

فَاِيَّاىَ فَارۡهَبُوۡنِ

"অতএব আমাকেই ভয় করো।"(সূরা আন নাহল :৫১)

সুফিয়ান সাওরি (র) বলেন,"দুনিয়ার বিমুখতা হলো আশা কম হওয়া।স্বাদহীন খাবার গ্রহণ করা আর ঢিলেঢালা আলখাল্লা পরা দুনিয়াবিমুখতা নয়।"

দীর্ঘ আশা একটি মারাত্মক দুরারোগ্য ব্যাধি। এই ব্যাধি যখন কারো কলবে বসে যায় তখন তার

স্বভাব,প্রকৃতি ও রুচিবোধ নষ্ট হয়ে যায়। বান্দার মাঝে আশা যত দীর্ঘ হয় তার আমল তত খারাপ হয়ে যায়। দীর্ঘ আশার ফলে মন শক্ত ও পাষাণ হয়ে পড়ে। আর নিয়তের বিশুদ্ধতার ফলে গুনাহ কমে যায়। দীর্ঘ আশার রোগে আমাদের অন্তর রোগাক্রান্ত হয়ে

পড়েছে। ফলে মানুষের যে একটি শেষ পরিণতি আছে তা আমরা ভুলে যাই। এই আবাস থেকে অচিরেই আমাদেরকে চলে যেতে হবে, তা আমরা অনুভব করতে পারি না। অথচ সালাফদের মাঝে সর্বদা এই অনুভূতি জাগ্রত থাকতো।

জনৈক সালাফ বলেন, "যতবারই আমি ঘুমিয়েছি, ততবারই নিজেকে বলেছি, এই ঘুম থেকে তুমি নাও জাগতে পারো।"

"হে লোকসকল, আমার একটি আশা ছিল ;কিন্তু মৃত্যু আমাকে সে আশা পূরণ করতে দেয়নি। যার এখনো আমল করার সময় আছে, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে। পৃথিবী থেকে কেবল আমি একাই বিদায় নিয়েছি তা নয়; এভাবে প্রত্যেককেই বিদায় নিতে হবে অচিরেই।" (আল-বিদায়া ওয়ান-নেহায়া :১৩/৪০)

দীর্ঘ আশা মানুষের যে পরিমাণ ক্ষতি করে, অন্য কোন বস্তু এতটা করতে পারে না। আর যে বিষয়টি মানুষের সবচেয়ে বেশি সময় নষ্ট করে, তা হলো তাসওয়িফ বা ভবিষ্যতে তওবা করবে বলে অপেক্ষা করা। সাঈদ বিন সাঈদ (র:) বলেন," সগিরা গুনাহের ক্ষুদ্রতার দিকে তাকিয়ো না বরং এর মাধ্যমে কার অবাধ্যতা হচ্ছে তার দিকে তাকাও।"(আজ জাহরুল-ফায়িহ : ৯৫)

ইসা রাদিয়াল্লাহু বলেন, "তিন ব্যক্তিকে নিয়ে আমার খুব আশ্চর্য হয়।

১. গাফিল; কিন্তু তার ব্যাপারে আল্লাহ গাফিল নয়।

২. দুনিয়ার বাসনাকারী ; কিন্তু মৃত্যু তাকে খুঁজে ফিরছে।

৩. প্রাসাদ নির্মাণকারী ; কিন্তু তার আসল ঘর হল কবর।"

হাসান রাদিয়াল্লাহু তার হৃদয় জাগানিয়া ওয়াজে বলতেন, 'আখিরাতের জন্য দ্রুত প্রস্তুতি নাও। কারণ জীবন কয়েকটি নিঃশ্বাসের সমষ্টি মাত্র। বন্ধ হয়ে গেলেই তোমাদের আমলের সময় শেষ, যে আমলের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে। আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে নিজে নফসের দিকে লক্ষ্য রাখে এবং গুনাহের সংখ্যা ও পরিমাণ নিয়ে কান্নাকাটি করে।' (আল ইহইয়া : ৪/৪৮৮)

দীর্ঘ আশা আমাদেরকে ধোকায় রেখেছে। একদিন ভালো হয়ে যাওয়ার কল্পনা আমাদের গাফিল করে রেখেছে। আমাদের যে কারো সাথে এমন হওয়া সম্ভব একটু এসে উপস্থিত হবে আর সে বলবে, 'হে আমার রব, আমাকে ফেরত পাঠান।' তিনি বলবেন, 'কেন ফিরে যেতে চাও?' সে বলবে, 'যাতে কিছু নেক আমল করে আসতে পারি।' আমাদের

সালাদের অবস্থা ছিল আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা সজাগ ও সচেতন হয়ে জীবন কাটাতেন। মৃত্যুর দিনের জন্য যা যা প্রয়োজন সবই আগেভাগে প্রস্তুত রাখতেন।
হাবিব আজমি রাদিয়াল্লাহু এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি সকালে স্ত্রীকে বলতেন, ‘আজ যদি আমি মরে যাই, তাহলে অমুক আমাকে গোসল দেবে এবং অমুক অমুক আমার খাটিয়া বহন করবে।’(সাইদুল খাতির :২০৪ পৃ.)
প্রতিদিন কারো না কারো মৃত্যু সংবাদ আমরা শুনি। আমরা ইন্নালিল্লাহ পড়ে কিছুক্ষণ চিন্তা-ফিকির করি।আবার আগের গাফিলতি ও দীর্ঘ আশায় ফিরে যাই। যেন মৃত্যুর ফেরেশতা আমাদের দরজার আশেপাশেও ঘেষবেন না, রুহ কবজ করা তো বহুদূর কি বাত!

ইলম ও আমলের প্রতি মনোযোগী হওয়া

দ্বীনি ইলম হলো সেই জ্ঞান যার মাধ্যমে একজন মুসলিম আল্লাহতালাকে সঠিকভাবে জানতে, তার ইবাদত করতে এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন,দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর নার নারীর জন্য ফরজ।
আমাদের যদি দ্বীন সম্পর্কে ন্যূনতম কোন জ্ঞান অর্জন না থাকে তাহলে কিভাবে নিজ পরিবারের দ্বীন পালনের জন্য পরামর্শ দেবো?ঈমানের অন্যতম দাবী হলো দিনের জ্ঞান অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,
“বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?”(সূরা আয-যুমার: ৯)
আল্লাহর ভীতি অর্জনের মাধ্যম হলো দ্বীনি ইল অর্জন করা। দ্বীনী ইলম মানুষকে তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতির দিকে পরিচালিত করে। তিনি বলেন,
“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরা তাকে যথার্থ ভয় করে।” (সূরা ফাতির :২৮)
আমি যদি মনে করি আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক জানি, তাহলে জ্ঞান অর্জনের দরজা আমি নিজেই বন্ধ করে দিলাম। তাই দ্বীন সম্পর্কে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে।
দ্বীনী ইলম অর্জনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে :
১। কুরআন অধ্যায়ন : নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত ও অর্থ বোঝার চেষ্টা করা।
২। হাদিস অধ্যয়ন :সহিহ হাদিস পড়া ও তা অনুযায়ী আমল করা।

৩। আলেমদের সান্নিধ্য গ্রহণ : যোগ্য ও বিশ্বস্ত আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করা, তালিম নেয়া।

৪। ইসলামী বই অধ্যায়ন : ফিকহ আকিদা ও আখলাক বিষয়ক নির্ভরযোগ্য বই পড়া।

৫। নিয়মিত শিক্ষা চর্চা করা : ইলম অর্জনের জন্য ধারাবাহিক অধ্যবসায় ও অনুশীলন করা।

ইল্ম অর্জনের অনেক উপকারিতা রয়েছে:

১। সঠিকভাবে ইবাদত করা যায় :দ্বীনি জ্ঞান ছাড়া শুদ্ধভাবে ইবাদত করা সম্ভব নয়।

২। হালাল ও হারাম সম্পর্কে জানা যায় : মানুষ বৈধ অবৈধ কাজের পার্থক্য বুঝতে পারে।

৩। ঈমান দৃঢ় হয় : দ্বীনি ইলম মানুষের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে।

৪। গুনাহ থেকে বাঁচতে সাহায্য করে : জ্ঞান মানুষকে গুনাহ পাপ থেকে সতর্ক করে। দ্বীনি ইলম একজন মুসলিমের জীবন পরিচালনার আলোকবর্তিকা। এটি মানুষকে আল্লাহর পরিচয়, ইসলামের বিধান এবং মানবতার শিক্ষা প্রদান করে। দ্বীনি জ্ঞান ছাড়া সঠিক ঈমান, শুদ্ধ ইবাদত এবং উত্তম চরিত্র গঠন সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দ্বীনি ইলম অর্জন করা এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য দ্বীনি ইলম অপরিহার্য।

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য তার পথে জিহাদের যে আহ্বান দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা, "তোমরা সংগ্রাম করো আল্লাহর পথে মাল দিয়ে এবং জান দিয়ে।" অর্থাৎ দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে অর্থের কুরবানী এবং শ্রম ও সময়ের কুরবানীর প্রয়োজন আছে। এই দুটো জিনিসের কুরবানী দেয়ার মত একদল মুমিন তৈরি হলেই আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বিজয় হবে

ইনশাআল্লাহ। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পথে চলার ক্ষেত্রে এই দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও ভোগবিলাসের মোহই আমাদের প্রধান অন্তরায়। এ মোহ কাটিয়ে উঠতে যাতে আমরা সক্ষম হই, সেজন্য আল্লাহ তালা আমাদের জানের কুরবানী করার ব্যাপারে বেশি বেশি করে তাগিদ করেছেন। আল্লাহর পথে বেশি বেশি করে মাল খরচের মাধ্যমেই আমরা দুনিয়ার ও পার্থিব জীবনের মোহ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হতে পারি। আল্লাহর পথে স্বাচ্ছন্দে এগিয়ে যেতে পারি। আলোর পথে অর্থ ব্যয়ের প্রধান উদ্দেশ্যই এটি।

উপসংহার

তাকওয়া ইসলামের অন্যতম মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, যা মানুষের আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি গঠন করে। এটি কেবল আল্লাহভীতি নয়; বরং আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা, আনুগত্য, জবাবদিহিতার অনুভূতি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার নাম। একজন তাকওয়াবান ব্যক্তি সর্বদা সচেতন থাকেন যে আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি কাজ, কথা ও চিন্তা সম্পর্কে অবগত। এই উপলব্ধি তাকে সৎকর্মে উৎসাহিত করে এবং অন্যায় ও পাপাচার থেকে দূরে রাখে।

তাকওয়া মানুষের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে, হৃদয়ে সততা, ধৈর্য, বিনয়, ন্যায়পরায়ণতা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে। এটি ব্যক্তি জীবনে আত্মশুদ্ধি, মানসিক প্রশান্তি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ সুগম করে। একই সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলে। যে সমাজে তাকওয়ার চর্চা বেশি, সেখানে দুর্নীতি, অন্যায়, প্রতারণা ও অপরাধের প্রবণতা কমে যায় এবং ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাকওয়া দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি। আল্লাহ তাআলা তাকওয়াবানদের জন্য তাঁর বিশেষ সাহায্য, রহমত, বরকত ও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করা, আল্লাহর আদেশ মেনে চলা এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

পরিশেষে বলা যায়, তাকওয়া হলো একজন মুমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং তার জীবন পরিচালনার সর্বোত্তম দিকনির্দেশনা। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—সকল স্তরে কল্যাণ, শান্তি ও সফলতা অর্জনের জন্য তাকওয়ার বিকল্প নেই। যে ব্যক্তি তাকওয়াকে জীবনের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে, সে দুনিয়ায় সম্মান ও প্রশান্তি লাভ করে এবং আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও চিরস্থায়ী মুক্তির অধিকারী হয়। তাই তাকওয়ার চর্চা ও বিকাশ প্রতিটি মুসলিমের জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।